KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩৩/২ ম. হীরেন সেন সরণী, কল-৬
Collection : KLMLGK	Publisher : মহাশ্বেতা সান্যাল (1, 2) অজিতকুমার সান্যাল (2/1)
Title অ (A)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 1 2 2/1 2/3 3/1	Year of Publication : Aug 1981 Nov 1981 Aug 1982 Feb 1983 Aug 1983
	Condition : Brittle Good ✓
Editor অজিতকুমার সান্যাল	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

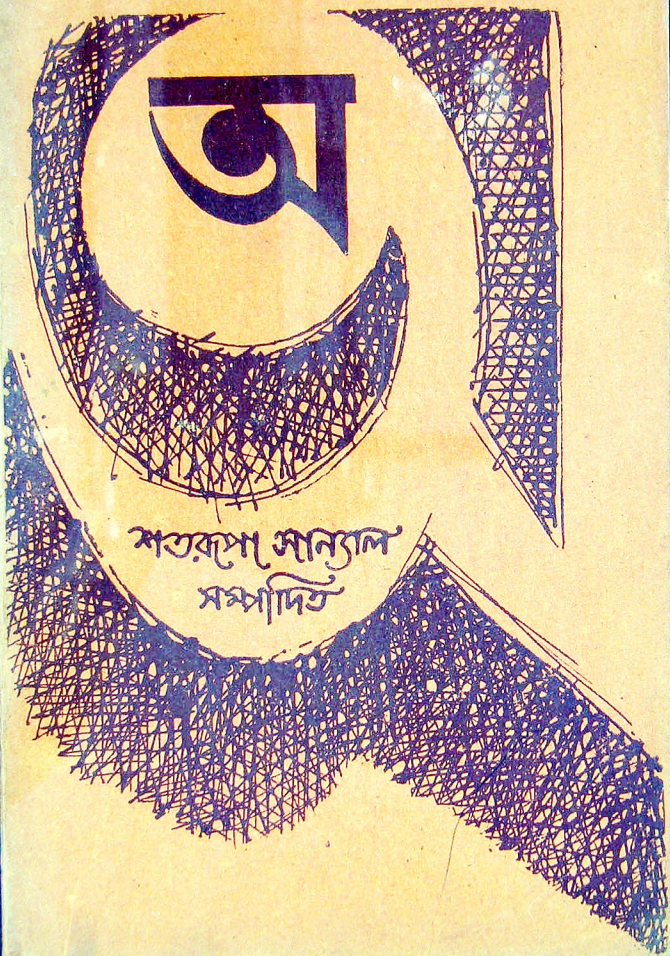

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে

পরিকল্পিত

২০ খণ্ডে সমাপ্য। ১৪টি খণ্ড প্রকাশিত। মোট মূল্য ৩৪৫ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি কালে ২৫ টাকা এবং প্রতি খণ্ড সংগ্রহ-কালে ১৬ টাকা দিতে হবে।

*　　*

বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি গ্রন্থ লিখছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩৬টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অ

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা/ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

এ সংখ্যার সূচী

প্রবন্ধ :

'লাশ কাটা ঘর' থেকে জীবনের দিকে :
'আটবছর আগের একদিন' তরুণ মুখোপাধ্যায় ১

বিয়োগ পঞ্জী :

কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য্য : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও
কবিতা পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৬

কবিতা গুচ্ছ :

বিতোষ আচার্য, নন্দিতা সেনগুপ্ত, প্রতিমা রায়, দেবী রায়,
শুভেন্দু মজুমদার, উদয় কুমার চক্রবর্ত্তী, শতরূপা সান্যাল ১১

গল্প :

আধখানা গোঁফ এবং সুতনুকা/অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী ১৬

প্রথম মৃত্যু
জেন এল আবিন এল হোসেনি অনুবাদ/হীরক সেনগুপ্ত ২৪

প্রচ্ছদচিত্র : চারু খান
সম্পাদনা : শতরূপা সান্যাল

সম্পাদকের কথা

"নীল কমলের আগে দেখি লাল কমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল ;
লাল তিলকে ললাট রাঙা ঊষার রক্ত রাগে
—কার এসেছে কাল ?"

—বিষ্ণু দে/নৈভোগ

সারা পশ্চিমবঙ্গে খরার তাণ্ডব শেষ হতে না হতেই আগামী বন্যার ভীতি জেগে উঠছে। চতুর্দিকে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। নামছে অন্ধকার। আসামে নরমেধ যজ্ঞ। পূর্বদিক থেকে ভেসে আসছে হাহাকার। এখন, কলম হাতে ধরলেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখগুলি ঘিরে আসে। নিরুপায় কবির লেখনীতে তাই ক্ষোভ, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে বেদনা সাধারণের হাত মুষ্টিবদ্ধ কিন্তু ভীত! চতুষ্পার্শের সব ঘটনাই যেন কোন্ অমঙ্গলের ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

'অ' সপ্তম সংখ্যা প্রকাশ এবং মাঝে তিনটি মাসের ব্যবধান। চলে গেলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে, ফরাসী কবি লুই আরাগঁ, বিশিষ্ট লেখক আবু সয়ীদ আয়ুব, কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেক বিশিষ্ট বিদগ্ধজন। বড়ই দুঃসময়। সব কাজের, সব লাজ ঘোচাবার দায়িত্ব বর্তায় উত্তর পুরুষে। সপ্তম পদক্ষেপে 'অ' তা স্মরণ করে এবং সকলকে মনে করাতে চায়।

'আমাদের যুগ সর্বোৎকৃষ্ট না হতে পারে,
কিন্তু তা আমাদের'
বর্তমান প্রজন্মের বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক

অ

পড়ুন ও পড়ান

বিশেষ সংখ্যাসহ এক বছরের গ্রাহক চাঁদা ৬ টাকা। ডাক খরচ আমাদের।

'লাশ-কাটা ঘর' থেকে জীবনের দিকে ঃ 'আটবছর আগের একদিন'

তরুণ মুখোপাধ্যায়

'আটবছর আগের একদিন' কবিতাটি "মহা পৃথিবী" কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত একটি বিতর্কিত গহন ভাবের কবিতা। 'বনলতা সেন' কাব্যে হাজার বছর পথ-হাঁটার পর, অন্বেষার পর কবি জীবনানন্দ দাশ যেন তাঁর অস্থিষ্ট কী বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তাকে হাতের মুঠোয় পান নি। তাই তাঁর চংক্রমণ অব্যাহত। কবি জীবনানন্দর কাছে এই বর্তমান বিরস গানের মতো। অতীত ও ব্যথাময়। তাই তিনি ভবিষ্যতের, আরেকটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। তাকে নির্মাণ করতে চান। সেই পৃথিবীই 'মহাপৃথিবী।' এই মহাপৃথিবীর আগে একটি পৃথিবী ছিল, যা নষ্ট হয়ে গেছে। নিদেন পক্ষে সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারলেও কবি শান্তি পান। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ছিল : 'ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ / পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই'—যাকে একবারই পাওয়া যায়—'এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায় নাকো আর।'

সুতরাং 'আটবছর আগের একদিন' কবিতাটি বুঝতে হলে কবি জীবনানন্দর এই মানসিক পটভূমিটুকু সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার। এবার দেখা যাক, আটবছর আগের একদিন কোনো এক মদির ফাল্গুনের রাত্রে একজন লোক কেন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। তার চাওয়া-পাওয়ার ইতিহাসই এই কবিতার বিষয়বস্তু।

সমগ্র কবিতাটি পড়ে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানতে পারি যে, একজন মানুষের যা পাওয়ার থাকে—নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, সবই সে পেয়েছিল। কোনো 'হাড়—হা ভাতের গ্লানি' কিংবা 'বেদনার শীতে' তাকে কাঁপতে হয় নি। তবু সে আত্মহত্যা করল।

কেন? যেদিন সে আত্মহত্যা করল তার পরিবেশটি স্মরণ করা যাক।—ফাল্গুনের রাত। আকাশে পঞ্চমীর বাঁকা বাঁকা চাঁদ। তার বিছানার একপাশে রূপসী যুবতী বধূ, আর শিশু শুয়ে আছে। অকস্মাৎ জ্যোৎস্নায় লোকটি চৈতন্য-স্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠল। যাকে আমরা বলি, 'ভূত দেখা'—কবি ও তাই বলেছেন। কিন্তু এ কোন্ জ্যোৎস্না? এই জ্যোৎস্না একটা মায়াবী আড়াল বা illusion মাত্র। যা আমাদের মোহ-গ্রস্ত করে রাখে। যা সত্য নয়, মিথ্যা, যা ফাঁকি, তাকেই সত্য করে লোভনীয় মোহময় করে আমাদের ভুলিয়ে রাখে। লোকটিও তাই এতদিন ভুলে ছিল ভেবেছিল জীবনের সার্থকতা বুঝি এই! 'দু' এক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতা' নিয়ে, 'দু' একটা 'ইঁদুর' নিয়েই জীবন কাটিয়েছে সে। কিন্তু যে মুহূর্তে চাঁদ ডুবে গেল, জ্যোৎস্না নিভে গেল, সেই মুহূর্তেই ধরা পড়ল জীবনের ফাঁকি। তার মনে হলো, এক জীবন সে ভুল জীবন যাপন করেছে। লক্ষ্য করার মতো 'জ্যোৎস্না' শব্দটি কবি 'প্রেম ছিল, আশা ছিল' এবং 'তবু সে দেখিল' এই দুই বাক্যের মাঝখানে দুটি ড্যাশের মধ্যে বসিয়েছেন। অর্থাৎ জ্যোৎস্না যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ এই প্রেম, আশা, বধূ, শিশু, অর্থ, কীর্তিকেই জীবনে শ্রেয়তম মনে হয়েছে। আবার এই জ্যোৎস্না লোকটির চোখে মায়াঞ্জন লাগানো সত্ত্বেও লোকটি অকস্মাৎ জাগরিত হয়েছে। 'তবু' এই অব্যয় ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন লোকটির মধ্যে খুব গোপনে খুব ভিতরে সেই 'বোধ' বা 'চেতনা' কাজ করেছিল, যার অন্যনাম 'বিপন্ন বিস্ময়'। এই জ্যোৎস্না যে মারাত্মকরূপে মায়াবী, প্রতারক, তা' বুঝেই লোকটির ঘুম ভেঙেছিল। বসন্তের রাত যেমন ক্ষণসঙ্গী, তেমনি সেই চাঁদের জ্যোৎস্না ও নশ্বর। হয়ত তাই মনে মনে সে চাঁদকে ডেকে বলেছে—

তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও, হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে যে অগাধ ঘুম তার আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও।

তুমি শুধু মায়া, মতি ভ্রম। এবং ফলতঃ তাই লোকটি 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর, অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে' আগ্রহী হয়েছে।

অথচ লোকটি যখন মারা যাচ্ছে বা মৃত্যুর জন্য উদ্যোগী হয়ে অশ্বত্থের কাছে সেই 'প্রধান আঁধারে' একা-একা (মৃত্যুর কাছে একা ও সরল হয়েই তো যেতে হয়!) যাচ্ছে, তখন প্রকৃতির চারিপাশে জীবনের তুমুল উচ্ছ্বাস। যে কোনো মুহূর্তে মরে যেতে পারে এমন গলিত স্থবির ব্যাঙ ও আরেকটি প্রভাতের জন্য দুই মুহূর্ত ভিক্ষা চাইছে। অন্ধকারে সঙ্ঘারামে মশারা জীবনের ক্লিন্ন স্রোত নিয়ে জেগে আছে। রক্ত-ক্লেদ-বসা থেকে মাছি পুনর্বার রৌদ্রাভিসারী হতে চায়। দুরন্ত শিশুর হাতে-ধরা ফড়িং বাঁচার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। আর থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অন্ধকারে জেগে বসে আছে 'দু' একটা ইঁদুর শিকার করার উদ্দেশ্যে। চারিদিকে জীবনের স্বাদ আর সাধ! শুধু একটি লোক এই স্বাদ ও আহ্লাদ অগ্রাহ্য ক'রে মৃত্যু-উন্মুখী। 'অবোধের মতন আহ্লাদ' আর অবসরে তার স্পৃহা নেই।' সে যেন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, এসব কিছুই নয়—'এহো বাহ্য'। 'দিবসের পিছে রজনী ভ্রমিছে, আশার পিছনে ভয়' এই বোধ তাকে তাড়িত করেছে। সকল লোকের মতো বীজবুনে শান্তি নেই। অন্ধকার সঙ্ঘারামে জীবনের গণ্ডলস্রোতে ভেসে ও তৃপ্তি নেই। সে আরো জানে 'মন' দিয়ে যে বাঁচে না, তার বাঁচাটাই মিথ্যা এবং ব্যর্থ। এই বোধই তার সব কাজ, সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় পণ্ড করে দিয়েছে; শূন্য মনে হয়েছে সব। তবু কবির প্রশ্ন, যে পেঁচা 'মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে জাগে একা অঘ্রাণে রাতে' সে কি লোকটিকে জানায়নি, জীবন বড় অমূল্য? যে চাঁদের আলোয় ঘাই হরিনীর দল প্রতারিত হয়, লোকটি ও হয়েছে, সেই চাঁদের আলো নিভে গেলে জীবনের অন্যতর স্বাদ কি লোকটি জানে না? তবে কেন সে ঘুমের জন্য উন্মুখ? অন্ততঃ পেঁচার "দুটো চোখে নাই এ ঘুমের কোনো সাধ" সে জানে, জীবন বেঁচে থাকার পক্ষে উপযোগী নয়। তবু এই জীবন—জীবনের এই স্বাদ সুপক্ক যবের ঘ্রাণের মতো। এই জীবন অধ্যবসায়ের। তাই সে বলেছে "চমৎকার" অধ্যবসায় ও সুযোগ জীবনকে মসৃণ, স্বাদু করে তোলে—এই "তুমুল গাঢ় সমাচার' সে জেনেছে; জানিয়েছে। কিন্তু লোকটি শোনে নি। কিন্তু কবি শুনেছেন। যদি ও তিনি শুনে ও নিঃসন্দেহ নন। যে লোকটি "আরেকটি পৃথিবীর দাবি স্থির করে নিতে" উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করল; যে জেনে ছিল, স্বধর্ম নিষ্ঠ রাত্রি বিনে" সেই মহাপৃথিবী, সৃষ্টি হবে না। তাহলে কি সে ভুল করল? পরক্ষণে কবি উত্তর পেয়ে যান। লোকটি

সম্ভবতঃ ভুল-ই করেছিল। কেননা, কবি জানেন—

মাটি পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হতো অনুভব করে,
এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে,
দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়—

সুতরাং 'যা হবার নয়, তাকে পাওয়ার প্রয়াস কবির মনে শ্রদ্ধা জাগায় নি। 'কাল কিছু হয়েছিল, হবে কি শাশ্বতকাল পরে?' এই দীন প্রশ্ন কবির মনে জেগে থাকে। শাশ্বতকালে কি হবে হতে পারে, তা তিনি জানেন না। বরং কাল যা হয়েছে, আজ যা হচ্ছে তা-ই ঢের। যদিও বর্তমান মানেই 'টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য তো "তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন" অনুভব করা যায়। যুথচারী অন্ধকারে সেই জীবনের স্রোত তাই কবিকে আকর্ষণ করে। এবং থুরথুরে অন্ধ পেঁচাও সেই জৈবিক জীবনের কথা-ই বলে—"চমৎকার! ধরা যাক্ দু'একটা ইঁদুর এবার!

কিন্তু কেন চমৎকার? "যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা" এটা সেই লোকটি জানত। কবিও জানেন। কবি আরো জানেন, একদিন এইসব পাখিদের স্নিগ্ধ জীবনে ব্যাঘাত ছিল না। মানুষের মতো কোন ইন্দ্রধনু ধরার ক্লান্ত অয়োজন ও তাদের ছিল না। এবং তাদের মানুষের মতো অর্থাৎ

পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাত ব্যথা আর কুয়াশার ঘর,
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত নেই তব,
নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

কিন্তু এখন তো তা' নয়। এখন পাখিদের জীবনে ও আছে অকস্মাৎ গুলির আঘাত, ব্রিজার্ডের তাড়া আছে, এবং জ্যোৎস্নায়, বনে তারা ও শিকার হয়।

অতএব বেঁচে থাকা আর 'চমৎকার' নয়। এই যন্ত্রযুগের অভিশাপে এখন "আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি" আর চারিদিকে মানুষের "গভীর নীলাভতম ইচ্ছা, চেষ্টা" এবং "সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে। "তাই" হে

প্রাগাঢ় পিতামহী আজো চমৎকার?" এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি কবির সব্যঙ্গ মানসিকতা যেমন প্রকাশ করে, তেমনি প্রায় অস্তমিত চমৎকারিত্বটুকু কে 'ছুঁয়ে ছেনে' নিতেও উৎসাহিত করেছে। বাঁচার অভ্যাসের মধ্যে ও মৃত্যু চিন্তা আমাদের যেটুকু নাড়া দেয়, তারই স্পন্দনে টের পাই, অতীত আমাদের ব্যর্থতাময়, বর্তমান ও তাই। ভবিষ্যৎ শূন্যগর্ভ। সুতরাং এক জীবনেই জীবনকে উপভোগ করা ছাড়া, নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? "চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন" সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। তাই "১৯৪৬-৪৭" শীর্ষক কবিতায় কবির বক্তব্য, মৃত্যু যেখানে অলঙ্ঘ্য, সেখানে 'তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে/কিছুটা সুস্থির ভাবে পেলে ভালো হতো," তাই কবি প্রপিতামহী পেঁচার সঙ্গে "জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার" নিঃশেষ করতে চান। যদিও শেষ প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকেই যায়, কেন লোকটি আত্মহত্যা করল? জীবনের ভাঁড়ার তো অপূর্ণ ছিল না যে 'বিপন্নবিস্ময়' লোকটির অন্তর্গত রক্তকে আলোড়িত করেছে, কবি জানেন তার উত্তর পাওয়া সহজ নয়। সকলেই নচিকেতা নয়। মৈত্রেয়ী ও ভূমা-র চেয়ে 'অন্নলোভাতুর' হয় অনেক সময়। আমাদের প্রচলিত জীবনের ধারায় আটবছর আগের একদিন' কবিতার লোকটি এক প্রবল ব্যতিক্রম। মৃৎপাত্রের মতো যে জীবনকে সে দু'পায়ে ঠেলে ফেলেছে, দু'হাত বাড়িয়ে আমরা তাকেই আঁকড়ে রাখতে চাই। সামগ্রিক মানব সমাজের সামনে এই শেষোক্ত ইচ্ছাই বলবতী। বাঁচা, শুধু বাঁচা!

লাশকাটা ঘর" ও "জীবনের স্রোত"—এদু'য়ের মাঝখানে কবি তাই ছুঁড়ে দেন সেই মহৎ জিজ্ঞাসা যার নাম "বিপন্ন বিস্ময়"। যা কোটিবে গুটিক মানুষের মন ছুঁয়ে যায়, বুক কাঁপিয়ে দেয়। বাকি সকলেই 'অন্ধকার সজ্ঞারাম' বেছে নিয়ে ভাবি, এই বেশ আছি। তাই "জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার" শূন্য করতে চান যে মানুষ, তাকেই আমরা পরমাত্মীয় ভাবি। কিন্তু যে এই সব "স্বচ্ছলতা" ছেড়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তাকে আমরা বুঝতে পারি না। আর এই বোঝা না বোঝার বেলা অবেলার মাঝ খানে জীবনের রোমশ উচ্ছ্বাস' আমাদের হাত ছানি দেয়। কেননা, আমরা তো জানি, মৃত্যু অনিবার্য। তাই যতক্ষণ পারি জীবনের দক্ষিণ মুখ দেখে যেতে চাই দু'চোখ ভরে। জলের মতন ঘুরে ঘুরে ফিরে যেতে চাই জলের ভিতরে॥

কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য্য : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রচার সব সময় সত্যি বলে না, আবার সবই মিথ্যা বলে, তাও নয়, কিন্তু যে প্রচারবিমুখ, তার প্রসঙ্গে সত্যি মিথ্যে, কোনো ধারণাই গড়ে ওঠে না; তার অন্তর্মুখীন স্বভাবের জন্য সহজীবী সাহিত্যিকদেরও পৃষ্টপোষণা কদাচিৎ তার ভাগ্যে জোটে। ফলে, জীবিত কালে তার প্রসঙ্গ উহ্যই থেকে যায়, হয়তো—মৃত্যুর পরেও।

জীবনানন্দ দাশের প্রতিভা, তাঁর জীবিত কালে মুগ্ধ করেছিলো খুব কমলোককেই; কোনো কোনো সমান বয়সী তা বুঝেছিলেন, অনেকেই তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন যথেষ্ট স্মার্ট আর শহুরে নন বলে; কিন্তু কিছু তরুণ কবি সেই সময়ে, অর্থাৎ যখন জীবনানন্দের গ্ল্যামার বলে কিছু নেই, নেই স্বস্থষ্ট চমকপ্রদ কিংবদন্তীর ঔজ্জ্বল্য, নেহাতই কবি যখন, তখন কিছু তরুণ কবি তাকে আরাধ্য জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন। 'কবিদের কবি সত্য দ্রষ্টা' বলে। তাঁর ভয়ংকর দুর্ঘটনা, হাসপাতালে টানাপোড়েন, শেষে সেই নিঃসঙ্গ কবির শেষ কৃত্যের দায় গ্রহণ পিতৃঋন পরিশোধের জন্য যেন, গ্রহণ করেছিলেন সে সব তরুণ, আর 'ময়ূখ' পত্রিকার—ঐতিহাসিক সংখ্যা—প্রকাশ করেছিলেন, যারা তাদের সেই সব কাজ এখন ইতিহাসের বিষয়। স্নেহাকর ভট্টাচার্য এই তরুণ কবিদের একজন; অথচ ওই প্রতিভার সম্মোহনীতে আক্রান্ত না হয়ে আমরণ লিখেছেন নিজের প্রতিভার কাছে দায়বদ্ধ থেকে, আশপাশের এই হট্টগোলের দিকে সম্পূর্ণ পেছন ফিরিয়ে।

একজন অসাধারণ কবির সান্নিধ্যে থেকেও, নিজের প্রবণতাকে আক্রান্ত হতে দেন না যে তরুণ কবি, তাঁর নিজের মধ্যেই ভয়ানক শক্ত একটা জোরের জায়গা রয়েছে। তাই, এপর্যন্ত প্রকাশিত দু' দুটো কবিতার বই নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকার দৃষ্টান্ত, নিজের ভাষায় কথা বলার উদাহরণ হয়ে আছে।

খুবই লাজুক, স্বল্পবাক্ দীর্ঘদেহী এই মানুষটি একজন কবি ছিলেন, একজন কবিই তাঁর প্রথম পরিচয় হতে পারে; যদিও ছাত্রজীবনে ও চাকুরী জীবনের প্রথম পর্বে অর্থনৈতিক লড়াই তাকে অবিশ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে, স্বল্পায়ু জীবনের শেষ পর্বেই মাত্র ভালো নিশ্চিত কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু, যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, আর খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে সেই নির্বাক হাসি দেখেছি 'তারপর, সাহিত্যের খবর কি ?' কারো প্রতিই, তা ব্যক্তি হোক বা হোক না প্রতিষ্ঠান, তিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি, আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্যে বা বিশেষ পদের জন্যে সামান্যতম অহং তিনি দেখাতে জানতেন না। এর কারণ, শুধু কবি ছিলেন তিনি, একজন খাঁটি কবি ছিলেন, প্রীতিময় অহংকারী ও নম্র, গোপন ও সুন্দর। তাই, তাঁর মতন ব্যক্তিত্বের অভাব এ মুহূর্তে বেশী করে অনুভব করছি আমরা।

এই সবই তাঁর কবিতাকে চিনে নিতে সাহায্য করে। সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি লিখেছেন খুবই কম, দুখানা কবিতার বই, লরেন্সের কিছু গল্পের অনুবাদ আর গুটি কয়েক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ। বই এর আলোচনাও তেমন একটা করেন নি, বর্ত্তমান লেখকের 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' সম্ভবত তার শেষ আলোচনা।

এতো কম লেখা নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, আমাদের অজস্র-প্রসবা লেখকদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি তা ছিলেন, খুবই কম লিখতেন। আর ভাবতেন তিনি। আমি তাকে ভাবতে দেখেছি, ভাবতে ভাবতে ঝুঁকে পথ হাঁটছেন, প্রায়ই একা, কখনো দু একজন বন্ধুর সঙ্গে। তিনি খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাঁর কবিতায় যে একা একা কথা বলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তা তাঁরই স্বভাবের অনুযায়ী; তিনি প্রেমিক ছিলেন, আক্ষরিক অর্থে প্রেমিক। প্রেমের জন্যে গভীর আর্তি ছিলো তার. কিছু হারিয়ে বসে আছেন তিনি, কবিতা পড়লে তা বারংবার মনে হতে থাকে। ক্রমশই তাঁর কবিতা পরিপার্শ্ব সচেতন হয়ে উঠছিলো, অর্থাৎ, তিনি নিজের মধ্যবিত্ত সামান্য সচ্ছলতাকে দেশের সাধারণ অর্থনীতিক মান বলে ভাবতে পারেন নি, ভুলতে পারেন নি, তার কষ্টের দিনগুলির কথা, যে রকম অর্থনৈতিক তীব্র লড়াই এদেশের আদর্শবাদী ছাত্র, যুবককে এক বয়সে লড়তেই হয়, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ছাড়া।

তাছাড়া যে শহরে আমরা থাকি, তার কুবের প্রতিম অহং আর সর্বস্বান্ত দীনতা একজন বিবেকবান মানুষকে প্রতি মুহূর্তে বিষণ্ণ করে নিজের সামান্য স্বস্তিকে ভেঙে চুরে দেয় বারবার , কবি আরো ভাবেন, ভাবতে ভাবতে মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়। এই কবি ছিলেন খুবই সংবেদনশীল, তাই পারিপার্শ্ব নিয়ে আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে তার কপালের শিরা ফুলে উঠতো; আর গ্রামগঞ্জের মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, আমাদের মধ্যবিত্ত ভাবুকদের কমই ভাবায়, কবি ভাবতেন। যদিও জানতেন, তিনি কিরকম অসহায়, নিরুপায়।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য সেনসিটিভ ছিলেন খুবই, তাই বিরক্ত হতেন, বিমর্ষ থাকতেন তা তাঁর কবিতা পড়ে যেমন মনে হয়, মানুষটিকে দেখে সহসা এরকম ভাবা কষ্টকর ছিলো। মুখে একচিল্‌তে দুষ্টু হাসি লেগেই থাকতো তাঁর। অথচ শার্টের নিচে বিষাদ কুরে কুরে খাচ্ছে তা টের পাওয়া যেতোনা। সেই বিষাদ কীট শরীরকে সম্পূর্ণ ঝাঁঝরা কোরে দিয়েছিলো! অবশেষে অকালে আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যু হলো তাঁর।

কিন্তু, কবিতার মৃত্যু নেই। কেননা, সেখানে শব্দবাহিত তরল আগুন রয়েছে, শব্দগ্রথিত দুঃখ ও আনন্দ :

> সত্তার ভিতর দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সৃষ্টি খোলে পরতে পরতে
> দুমড়ানো নদীতে দুটো কাক
> গলিত শবের পিঠ খুঁটে খেয়ে ভরা পেটে অদ্ভুত আওয়াজে
> ভোরের সংবাদ আনে, দড়িটানা ভিথিরী-শকটে উবু হয়ে
> খঞ্জের মতন সূর্য কর্কশ চেঁচায়—
> কলকাতা খানকির মত হাঁটুর উপরে শায়া তুলে
> উঠে বসে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।
> (—মাথার উপরে চাঁদ / তৃষ্ণার তমসা)

অসাধারণ চিত্রকল্পে কলকাতার নগর-চিত্র; তার নিঃস্বতা, দ্রুত সর্বস্বতা ধরেছেন স্নেহাকর। একজন ভুক্তভোগী নাগরিক সত্তার ভিতরেই কি এই দৃশ্য দেখেন, না বাইরেও অবিকল দৃশ্য এরকমই, এর চাইতেও বেশী কিছু!

স্নেহাকর দীর্ঘ কবিতা বেশী লেখেন নি। তাঁর কবিতা যতোটা চিন্তাগ্রস্ত, অনুভূতিগ্রস্ত ততোটাই। 'মাথার উপরে চাঁদ' একালের বাংলা ভাষার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতার ভাবনার স্তর, টানটান অনিবার্য শব্দ সংস্থান, আর অতি সাম্প্রতিক কলকাতা তথা নগর সভ্যতার 'হলোনেস' খুব কম কবির লেখাতেই পেয়েছি। আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ অন্তত এ কবিতা পড়ার পরে আর থাকেনা।

> কাদের কলকাতা ওই ভোরবেলা সোনার মন্দির হয়ে আছে
> স্তোত্রের মতন বহে নদী—
> সকল তিক্ততা থেকে জয়ধ্বনি নিয়ে
> পাখি যায় ঈশ্বরের পদতলে নীলিমা অবধি।

এই ভিন্নকে দেখা, বিপরীত যে একের মধ্যেই আছে, কলকাতার শুধু 'খানকির মত হাঁটুর উপরে শায়া তুলে' উঠে বসেনা 'সকল তিক্ততা থেকে জয়ধ্বনি নিয়ে/ পাখি যায় ঈশ্বরের পদতলে নীলিমা অবধি' এই কলকাতারই আকাশে, এই সামগ্রিক দেখাই সত্য দেখা, এ দেখা স্নেহাকরের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। খুব নিবিষ্ট চোখে চশমার তলার কাচের ফাঁক দিয়ে দেখতেন, কখনো তির্যক, কখনো সরলভাবে। কবিতায়ও এই সারল্য তার 'অনুভূতি দেশ' খুবই খাঁটি ছিলো, সেখানে প্রেম বা শৈশব স্বপ্নের দেশের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে বেদনা ছিলো, বিষাদ ছিলো, যা থাকে যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষের, থাকে স্বাভাবিকভাবেই একজন কবিরও। আবার সমকাল তাকে ভাবিত করেছে, চিন্তাক্লিষ্ট করেছে।

> পৃথিবীর পরিধি যেন
> সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আগে মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলেও
> দিগন্ত অনেক দূরে থাকতো; আজকাল
> দুপা এগোলেই পার্টিশানে মাথা ঠুকে যায়।
> দাবার ছকের মতো ছোট ছোট ঘর, একটাতে কিছুদিন থাকি
> তারপর সেখান থেকে কেউ
> অদৃশ্য যন্ত্রে ধীরে ধীরে সমস্ত বাতাস টেনে নেয়,
> আমি আর একটা ঘরে চলে আসি

পৃথিবী ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, দু'পা এগোলেই পার্টিশানে মাথা ঠুকে যায়, এ বোধ আমাদের এই সময়ের। কেন এমন হয়। সেই অসামান্য সংক্ষিপ্ততম কবিতাটি উদ্ধৃত করছি।

ঘাতকেরা আজকাল মুখোশ পরে না।
আত্মপরিচয় গোপনের প্রয়োজন
ফুরিয়ে গিয়েছে কবে! মানুষের অপমানচিত্র জুড়ে আজ
ঘাতক নিজেই বিচারক।
তারা শোভাযাত্রা করে আসে যায়, মালা ছুঁড়ে দেয়,
এবং নতুন ভূমিকায়
সারাক্ষণ
মানুষ মুখোশ পরে থাকে।

স্নেহাকর এই 'মুখোশ'কে ঘৃণা করতেন। তার ব্যক্তিগত জীবনে খুব কম লোকের সঙ্গে মিশতেন, তাও বেছে বেছে। কেন? গ্লানিকর অভিজ্ঞতার জন্যে? মানুষের যে ছবি তিনি দেখতে চান, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই বলে? কিন্তু অভিযোগ করেননি, শুধু কবিতায় এই নৈরাশ্য ও তিক্ততার কথা সূক্ষ্ম শিল্পায়িত ক'রে প্রকাশ করেছেন।

কণ্ঠ

বিতোষ আচার্য

কণ্ঠ আমার ছড়িয়ে দিলাম নিরিবিলি ছাদে :
ঘূর্ণি হাওয়ায় পেঁজা তুলো কথা উড়ে গেল কোন দিগন্তে
আমার কণ্ঠ আকাশকে পেল আজ।

সন্তর্পণে নেমে নেমে গিয়ে বিকেলের খাদে
সাপের খোলস খড়, ধুলো, শীত তুলে হৃদয়ের সীমন্তে
একদা করেছি অতি অপরূপ সাজ :
কণ্ঠ ভাসিয়ে সন্ধ্যার ঝুলে হয়েছি নাকাল
কোনো মানুষের মরমী-আলাপ থমথমে সেই রাত্রিকে
দোলাতে পারেনি, ওঠেনি গলার স্বর।

শীত চলে গেছে ব্যর্থ মননে : সে এক রাখাল
ধুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে অন্ধ করেছে জীবনের তাপদাত্রীকে
ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তুলতে চেয়েছে ঝড়।

বিবর্ণ সাজ, বিফল মনন উড়িয়ে দিলাম
ঝোড়ো চৈত্রের পাঁপড়ী-পলাশে ঠোঁট অপরূপ জীয়ন্ত
পাগলা আকাশে ওড়ে যেন শত বাজ :
কণ্ঠ আমার কাঁপনের মতো ছড়িয়ে ছিলাম
ঘূর্ণি হাওয়ায় ঢেউ তুলে তারা হয়ে গেল এক দিগন্ত
আমার কণ্ঠ আকাশকে পেল আজ॥

যখন ছিলাম গভীর ঘুমেরত

নন্দিতা সেনগুপ্ত

যখন ছিলাম গভীর ঘুমেরত
মনের গোপন পাপড়ীগুলোয়
আলতো হাতে ছুঁয়ে
শেষ গোধূলীর রক্তস্নানে
ফুলগুলোকে ধুয়ে,
বিলিয়ে দিয়ে সবার হাতে
নয়ন দু'টি নত,
কিসের জন্য কাটিয়ে প্রহর
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ
কী প্রতীক্ষায় রত।

সাময়িকী

প্রতিমা রায়

একজন হেসে বলেছিলো ··গাছতলায় থাকবো,
আর একজন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেই খুন!
আহা এমন খুন যেন কেউ কখনও না হয়!

এদের দুজনকেই মানুষ হতে হয়েছিলো
অথবা চেয়েছিলো,
সম্ভব হয়নি।

আসলে মানুষ কখনও হওয়া বা পাওয়া যায় না
সাময়িক সেজে নিতে হয়।

বাস গেছে বনবাসে

দেবী রায়

সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে
জবাব ছোঁড়েন তিনি, বাঁধা গতের·····

'গতিবিধি?' বল্‌তে চান, 'মেজাজ মর্জির?'
'পারলে নিশ্চয়, কে-না করে! তেমন মুরোদ—

অবশ্য যদি থাকে।' এক তাচ্ছিল্য-আয়েসে
'সময়-রক্ষাকারী' মুখ-মুচ্‌কে হাসে!

খুন চাপে, স্রেফ খুন চ'ড়ে যায় মাথায়
খুন চাপে, স্রেফ খুন চ'ড়ে যায় মাথায়

ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আর বীভৎস সর্বনাশে
ভয়ংকর দন্ত কিড়িমিড়ি কেউ, ঘর্ঘরে কাশে

আর এদিক থেকে-ওদিক, একদল
প্রাণ হাতে' নিছক ঘরমুখো পাগল—

ঘূর্ণিঝড়ে ভাসে! কার বা পৌষ, কার যে সর্বনাশে
পাওয়ার কাট? সে-ও নিয়মমাফিক আসে!

এ শহরে বোকাহাবা শুধু একজন, ঘুরে ঘুরে
ছাখে রাম নয়, বাস গেছে বনবাসে!!

বোধি

শুভেন্দু মজুমদার

এক

ভাসিয়ে নাও
হব উধাও
রূপ সমুদ্র পার।
বুকের ঢেউ –
কাঁদে কি কেউ?
পরোয়া করি না তার।

দুই

শিকল হীন
সঙ্গী লীন
খরায় জ্বলে বুক!
মৃত্যু-হাত
বাড়ায় রাত
পাথরে লুকাই মুখ।

তিন

দরজায় করাঘাত—
তামসী বাড়ায় হাত।
কেউ কি আছে পাহারায়?
সব হারানো সাহারায়।

হিশেব

উদয় কুমার চক্রবর্তী

কি কি ভালো লাগতো—তার হিসাব কষে নাও।
মনে রেখো—একসময় চায়ের গ্লাস হাতে রাস্তার
বেঞ্চে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে ভালো লাগতো।
ভালো লাগতো—ছুটির পর ক্লাসের সীমানা পেরিয়ে
হৃদয় হারিয়ে ঘুরে আসা। ভালো লাগতো বাতাসে
ভ্রমরের মতো সুর তুলে গুঞ্জনরতা নারীর কাছে
বসে শুধু একটি কথা বারবার বলতে—একমাত্র
তুমি-ই আমাকে নির্বাসিত করেছো স্বচ্ছল স্বপ্ন
থেকে বৈরাগী দীঘিতে।
—তারপর প্রাজ্ঞবিবেক;
আজ উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ অয়নে
তাকিয়ে, নির্মম স্থবিরত্বের জ্বালায় ভাবতে চেষ্টা কর
এখনকার মুহূর্তগুলো পূর্ণমাত্রায় হিশেবী: জমিজমা,
ব্যাঙ্কব্যালেন্স, স্থাবর, অস্থাবর এখন সবকিছুই এই
চায়ের গেলাস ধরা হাতের মুদ্রায় নির্বাসিত॥

কেমন করে

শতরূপা সান্যাল

কেমন করে এক পলকে দৌড়ে পালায়
হেমন্তের এই উষ্ণ রোদের লাজুক বিকেল
পাথর পথের বুক চেরা ওই অশথ গাছ
হাতের মুঠোয় অদৃশ্য দিন ভোজবাজী খেল।
তরুণ দিনের রক্ত গোলাপ মধ্য দুপুর
আলতো ছোঁয়ায় মাথার মধ্যে মশাল জ্বালায়
স্নিগ্ধ সুখের নির্ভরতাও রাহুর টানে
হঠাৎ দেখি দৌড়ে পালায় দৌড়ে পালায়॥

আধখানা গোঁফ এবং মুতনুকা

অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী

একদিকের গোঁফটা কামিয়ে উঠতেই সদরে কড়া নড়ে উঠলো,

—কে ?

—একটু খুলুন না। এই সেরেছে, বামা কণ্ঠ যে! নিখিল গালের সাবান গামছায় মুছে উঁকি দিলো দরজা খুলে,

—একটু ভেতরে আসতে পারি ?

নিখিল চমৎকৃত হয়। বেগুনী থানের ওপর সাদা ফুলের এমব্রয়ডারী, কাঁধে ঝোলানো আনকোরা Adidas. রুমাল বার করে থুতনির ঘাম মুছছে মেয়েটি, অদ্ভুত সপ্রতিভ। আবেগ দীপ্ত হয়ে ওঠে নিখিল মুহূর্ত্তেই। আহা! কি সিচুয়েশন! অবশ্য আধ কাটা গোঁফটা কাব্যস্ফুরণের পথে জাঁদরেল একটা কমা হয়ে রইলো। তবু মনেপ্রাণে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে নিখিল।

—আসুন, ভেতরে আসুন,

কোনোরকম ব্যস্ততা দেখান না মহিলা, অস্বস্তিও নয়। নিখিলকে টপকেই ঘরে ঢোকেন ওর। চৌকিতে বসে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামান।

—উফ্! লোডশেডিং ?

নিখিল তাড়াতাড়ি পাখাটা চালিয়ে দেয়।

—ক'দিন একটু কম হচ্ছে এদিকে।

—টু লাকি ইয়্যু আর্! আমাদের ওদিকে তো...: কথা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ান ভদ্রমহিলা, ঘরের কোণে টি.ভি। টি.ভি-র কভারে লেসের কাজটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতেই পেছনে ফেরেন

—সত্যিই ভাগ্যবান আপনি; এমন গুণী স্ত্রী পাওয়াও...

—না না, ওটা আমি গত হপ্তায় নিউমার্কেট থেকে আনিয়েছি ; তাছাড়া,...

নিখিল কথা শেষ করতে পায় না। বাইরে কড়া নড়ে আবার—বেশ একটু জোরে।

—আঃ জ্বালালে দেখছি;·· একমিনিট, আঙ্গুল তুলে 'এক' দেখায় নিখিল। মহিলাটি মিষ্টি হেসে ঘাড় কাৎ করেন। আরো একবার চমৎকৃত হতে হল নিখিল কে।

দরজা খুলতেই এক শ্মশ্রুগুম্ফহীন অবতারের দেখা মেলে।

—আপনি,...আপনাকে তো,·· ঠিক,

—নাম বললে চিনবেন না আমায়, বিগলিত হাসিতে উত্তর আসে। নিখিল একটু বিরক্ত হল. অতটা হাসি আর নিজের অর্দ্ধ 'শেভ' ইত গোঁফের সাথে একটা সম্বন্ধ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—ওঃ তা কি ব্যাপার বলুন।

— আজ্ঞে, আমি প্রসিদ্ধ গন্ধ নির্মাতা হরেকেষ্ট পারফিউমারীর সেলস্ এণ্ড সার্ভে ডিপার্ট ··

—আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি,···

নিখিল মুখের কথা কেড়ে নেয়। আলোচনা দীর্ঘতর করার কোনই ইচ্ছে নেই তার। অপর তরফে কিন্তু উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায় না, কথার ওপর কথা চলে, হেঃ হেঃ দাদা, বুঝলেন তো। সৌরভেই আমাদের গৌরব।

এই যে দেখছেন,...ছোট্টো একটা শিশি নিখিলের নাকের সামনে ফটাস করে খুলে ধরে লোকটি। একফোঁটা তরল চল্‌কে কর্তিত গোঁফের দিকটায় পড়ে জ্বলতে শুরু করে। নিখিল অধৈর্য্য হয়,

—আঃ বলছি তো, আমি এইসব ···

—প্লিজ, এভাবে ফিরিয়ে দেবেন না, আমরা পঁচিশজন যুবক,···নিখিলের সহ্যের মাত্রা শেষ হয়।

—প্লিজ স্টপ ; একথা আমিও বহুবার শুনেছি। এমনকি মুখস্থ ও হয়ে গেছে, বলব ? যুঁই—চামেলী—গন্ধরাজ—নন্দন কাননের পারিজাত ফুলের নির্যাস থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী এ সেন্ট —বাতাসে উড়বে, ফুরাবে না, মনে ধরবে রঙ কিন্তু জামায় ধরবে না,

—কিন্তু !

—কোনো কিন্তু নয়। মশাই ; আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এ নিয়ে ; দয়া করে আপনি ;

—"অন্ততঃ একবার," নাছোড়বান্দার মতো বলে ওঠে,যুবক

—'না' নিখিল অধৈর্য হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,

—"বলছি তো আপনাকে, কেন অযথা এভাবে আপনি বরং ঐ সামনের ফ্ল্যাটটাতে ··নিখিল হাত তুলে পাশের ঘর দেখায়।

যুবক অগত্যা পিছু হাঁটে। খারাপ লাগে নিখিলেরও—কিন্তু কি আর করা।

* * *

গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢোকে নিখিল, বইয়ের আলমারী দেখিয়ে বলে ওঠেন ভদ্রমহিলা

—দারুণ কালেকশন তো আপনার। নিখিল খুশী হয়।

—গরীবের ঘোড়া রোগ বুঝলেন। ছাত্রজীবনে বই কেনার একটা বাতিক ছিলো আমার। কিন্তু ঘরদোরের যা অবস্থা। এই তো কিছুদিন আগে বই ঝাড়তে গিয়ে দেখি প্রায় একডজন বই বরবাদ, উইয়ে কেটে শেষ করে রেখেছে। এতো কষ্ট হয় না তখন।

—কেন, পেস্ট কণ্ট্রোল-এ খবর দিয়ে দিন না। এই কালীঘাটেই তো কোথায় যেন ওদের একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে ; দে মাইট হেল্প ইউ।

—হ্যাঁ আমিও শুনেছি ওরকম একটা কথা, ওরা নাকি এসে রাণী উইটাকে খুঁজে বার করে। ওটাকে মারলেই সব ঠাণ্ডা, উইবংশ আর বাড়তে পায় না।

—বাঃ। বেশ ইণ্টারেস্টিং তো ব্যাপারটা। কতোরকম কৌশল যে বেরিয়েছে।—ভদ্রমহিলা হঠাৎ বুঁদ হয়ে গেলেন, কে জানে, উই-নির্ধনবৃত্তান্তের অভিনবতায় কি না। নিখিল পড়লো মুস্কিলে। সেই আসার পর থেকে হাজার গণ্ডা কথা হয়ে গেল, কিন্তু জানা হল না ভদ্রমহিলা কে? ঝা করে প্রশ্ন করলে হয়—'আপনি কে মশায়'—কিন্তু একটু বাধো বাধো ঠেকে। যেভাবে জমিয়ে গল্প করছেন মহিলা। দেখা যাক কিছুক্ষণ নিজেই কিছু বলেন কি না— নিখিল ভাবলো কিন্তু সে ভাবনা একান্ত নিখিলেরই। ভদ্রমহিলা কেবল প্রসঙ্গ থেকে

প্রসঙ্গান্তরে ঘুরে ফিরতে লাগলেন। নিখিলের মনে হল কিভাবে যেন আপার হাণ্ড টা বেহাত হয়ে গেছে। কথা বলছেন উনিই, নিখিল শুধু তার জের টানছে। জড়তা কাটানোর জন্যই ড্রেসিং টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা এনে চেয়ারে বসল। কাঠি ঘষলো একবার, দুবার, তিনবার

—"এই হয়েছে এক ঝামেলা"-আবার তিনি দেশলাই কাটি নিয়ে পড়লেন, "সারা বাজার ছেয়ে ফেলছে রং বে-রঙা বাক্স, সবকটাই সমান বাজে। এর থেকে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালানো সোজা।

—যা বলেছেন, নিখিল চতুর্থবার সফল হয়।

—আরো কি মজা জানেন, আজকাল যে শক্ত কাগজের প্যাকেটগুলো বেরিয়েছেনা, তাতে দেখবেন, কখনোই বাক্সভরা কাঠি পাবেন না। অথচ ওপরে—এ জ্বল জ্বল করছে "Matches 50" মানে হয়!

—ঠিক বলেছেন আপনি। আমি তো নিজের চোখে একবার এক ব্যাটা দোকানদারকে বাক্স ফাঁক করে কাঠি বার করতে দেখেছি।

কোরাপশান! কোরাপশান! 'আগা সে গোড়া' জাতটা কোরাপটেড হয়ে গেছে, এই যে বিদ্যুৎ সংকট—দিন নেই, রাত নেই, নাটকের কুশীলবের মতো আলো যাচ্ছে আর আসছে—এর কারণটা কি? আমার তো মনে হয় এর বেশীরভাগটাই ক্রিয়েটেড প্রোবলেম ; স্বাধীনতা আজ কতো বছর হলো বলুনতো দেখি তবু এতদিনে ঘাটতি মেটে না। ছিঃ, তাকিয়ে দেখুনতো চায়নার দিকে রাশিয়ার কথাই ধরুন না ; ওদিকে জাপান বলুন ম্যা রিকায় তো···।

বহুক্ষণ বাদে একটা মনের মতো বিষয় পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে নিখিল মুখের কথা কেড়ে নিয়েই শুরু করে –

—আসলে ভারতের ব্যাপারটা কি জানেন। এমনই একটা সিস্টেম।—

– ওসব সিষ্টেম ফিষ্টেম্ বুঝি না। আমি বুঝি কাজ ওয়াকরসমাস্ট বী সিনস্যার অ্যাট দেয়ার ওয়ার্ক, মহিলা নস্যাৎ করে দিতে চান নিখিলকে।

—কিন্তু কোন্ সেট আপ এ তাকে কাজ করতে হচ্ছে সেটাও কনসিডার করা দরকার।—নিখিল না বলে ছাড়ে না।

—কাজ! কাজ কে করে বলুন! সবাই তো আজকাল ঝাণ্ডার নীচে

থাকে ; একটা ফ্যাকটরী তে সাতটা ইউনিয়ন থাকলে সেখানে কাজ হয় কিছু ? হয় না হতে পারে না। কাজে ফাঁকি দেবার ফন্দিটা এদেশে সবাই শিখে ফেলেছি আমরা হুঃ, ইউনিয়ন !

ঠোঁটের কোনায় একটু ব্যথা জমে যায় মহিলার। সত্যি !. সুন্দরীরা ঠোঁটও বেঁকায় সুন্দর করে, নিখিল ভাবলো, অবশ্য প্রতিবাদ করতে ছাড়লো না সেও।

—বাঃ ! তাই বলে শ্রমিকেরা জোট বাঁধবে না ? কি তাদের চাহিদা, কোথায় তাদের গ্রিভিয়েন্সেস্ ; এসব জানানোর জন্যই তো দরকার এরা লোকবল ছাড়া মালিকের বিরুদ্ধে আর কি হাতিয়ার আছে এদেশী শ্রমিকের ?

—আমি একটু অন্যরকম ভাবি। মোর দ্যা প্রোডাকশন্ দ্যা বেটার উইল বি দ্যা কণ্ডিশন্ অফ্ ওয়ার্কার্স্। বেশী খাটো, বেশী বানাও, বেশী খাও এই হল আমার পলিসি।

—আরে ! আপনিতো দেখি চা বাগানের মালিকদের মতো কথা বলছেন !—উত্তেজনায় সিগারেটের ফিল্টারটাও ফুঁকে দেয় নিখিল।

প্রোডাক্সন-এর দিকেই যদি একমাত্র নজর থাকে তবে তো।

—ইস্ ! চা-য়ের কথা মনে পড়িয়ে দিলেন ! আমি আবার এ ব্যাপারে একটু বেশী মাত্রায়,...অবশ্য...

নিখিল একটু অবাক হ'লো। একিরে বাবা ! চেনা নেই, জানা নেই, অপরিচিত লোকের বাড়ী এতক্ষণ ! ভর দুপুরবেলা ! একি ধরণের উগ্র আধুনিকতা ! একবার সন্দেহ হল—মাথা-টাথা খারাপ নয়তো ! কতোরকমের পাগলের কথাইতো শোনা যায়। এই তো সেদিন, বোলতাকাকার মুখেই শুনলাম। ট্রেনেই পরিচয় সেই প্রৌঢ়ের সাথে সারাটা রাস্তা কানের পোকা বার করেছেন কাকার, কৃষ্ণমূর্তির নৃত্যকলা থেকে ইনস্যাট-ওয়ান-এ পর্যন্ত কিছুই বাদ রাখেননি। সব বিষয়েই সমান পাণ্ডিত্য ভদ্রলোকের। শুধু নামার আগে বোলতাকাকার কানে কানে বলে গিয়েছিলেন—

—"খোকন সোনা একটা হামি দাও তো।..." তা সে, নিখিলের মনে যাই থাক, ভদ্রতার খাতিরে বলতেই হলো—না, না ; অসুবিধার কথা ভাববেন না। আমার বাড়ীতেই চা'য়ের অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে।

—তা বলছি না।...ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখলেন। ভাবছিলাম,...আজ তো হাফ্-ডে,...নন্দিতা এলেই নাহয়,...একসঙ্গে ;

নিখিল অবাক হয়ে তাকালো,—তার মানে ?

মুচকি হাসির সাথে উত্তর আসে, —মানে ? নাঃ, নন্দিতা একটুও বাড়িয়ে বলেনি দেখছি। কিন্তু এতোটা ভুলো মন তো ভালো না।

—কি বলছেন কি ? কে নন্দিতা ?

—ওমা ! কোথায় যাবো ! কপট হতাশার ভান করে মেয়েটি।

এ যে বঙ্কিমের 'ভ্রান্তিবিলাস' বানিয়ে তুললেন দেখছি। এইরকম দায়িত্বশীল ছেলের হাতে সোনাকাকী মেয়ে দিলেন কি করে ?

—আঃ, কি যা তা বলছেন তখন থেকে !

—যা তা বলছি ! আমি ! মেয়েটির নির্বিকার মিটিমিটি হাসি তখনো চোখের কোনায় দপ্‌দপ্ করছে।

—বেশ, আপনি বলুন এবার, এটা ২৮/১ সাধুভাই মিত্তির লেন কি না !

—হ্যাঁ তা

—বেশ, আমার সামনে যে মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এই মহানগরীর এক প্রাইভেট কনসার্ন-এর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র কি না !

এবার নিখিলও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ; আমতা আমতা করে বলে—

—হ্যাঁ, আশ্চর্য ! কিন্তু

—আর কিন্তু টিন্তু দরকার নেই প্রদোষবাবু ; অনেক হয়েছে ; ভেবেছিলাম প্রথমেই পরিচয় না দিয়ে একটু স্টার্ট দেবো, কিন্তু এককাপ চা-খাওয়াতে গিয়ে এতো গণ্ডগোল বাধাবেন জানলে,...আচ্ছা বলুনতো, একটুও মনে পড়ছে না আমায় ? এতক্ষণ দেখেও ! নন্দিতার বিয়ের ঠিক পরে পরেই তো আমার ছবি পাঠিয়েছিলাম কোয়েটে থাকাকালীন, আমি হলাম সেই সুতনুকা ব্যানার্জী নন্দিতার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড,...কি ! মনে পড়ে !...

বক্‌বক্ করে অনেক কথাই বলে মেয়েটি নিখিলের কানে যায় না বিশেষ কিছুই। বিড়্‌বিড়্ করতে করতে হাত তোলে নিখিল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান! কি নাম বললেন? প্রদোষ! ইয়্যা মীন্ প্রদোষ গুপ্তা! তাই না?

এবার অবাক হবার পালা সুতনুকার। এতক্ষণের বাগ্মীতা কোন এক মন্ত্রবলে ধুয়ে যায় যেন। কোনোরকমে ঘাড় কাৎ করে নিখিলের কথায় সম্মতি জানালো সে।

—এ্যাঁ! আপনি প্রদোষের স্ত্রী,...মানে আমাদের নন্দিতার বান্ধবী! মাই গুডনেস! এতক্ষণ বলেননি...

হা-হা করে হেসে ওঠে নিখিল। এই তাহলে ব্যাপার। সুতনুকার তবু ধাঁ-ধাঁ লাগে। কুণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করে।

—তা হলে আপনি!

—আমি শ্রীমান নিখিল গাঙ্গুলী; প্রদোষের কলিগ।

—ওঃ! My God. সুতনুকা এতক্ষণে আবার ঘামতে শুরু করে, বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা'য়ের নখ ঘষতে থাকে।...

—কিন্তু, এই বাড়ীতেই তো!...ধরা গলায় প্রশ্ন করে ও।

—হ্যাঁ ওনারাই ছিলেন, বিয়ের ছমাস বাদে লন্ট লেক এ উঠে গেছেন। তারপর থেকে আমিই...

সুতনুকা ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায়।

—ছি ছি, আপনাকে...এভাবে অযথা বিব্রত করে।

—কিচ্ছু ভাবার নেই, বিব্রত হবার মতো তো কিছু...।

—কি বলছেন আপনি,...ইস্...খুব খারাপ লাগছে আমার।

—আমার ব্যাপারটা অন্য। বুঝলেন না, ছুটির দিন, বেশ কেটে গেল খানিকটা সময়।

—আচ্ছা, ওদের ঠিকানাটা যদি দয়া করে একবার দেন, সুতনুকা ব্যাগ তুলতে যায়। হাঁ-হাঁ করে ওঠে নিখিল।

—উঃ হু হু, ওটি করবেন না। হঠাৎ ভীষণ থতমত খেয়ে তাকায় সুতনুকা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে নিখিলকে, ধারালো গলায় প্রশ্ন করে।

—তার মানে?

—মানে একটাই। আপনি আমায় চা-য়ের খোঁটা তুলে কিপ্টে' অপবাদ দিয়েছেন। সুতরাং চা না খেয়ে মুক্তি নেই আপনার—তা সে যেমন স্বাদেরই হোক।

ঝর্‌ঝর্ করে হেসে উঠলো সুতনুকা।

—সাংঘাতিক লোক তো আপনি, কখন আবার কিপটে বললাম!

নিখিল হাসতে হাসতেই চা'য়ের সরঞ্জাম ঘাঁটাঘাঁটি করে। সুতনুকা এগিয়ে আসে।

—সরুন, সরুন। তেতো চা'য়ে আসক্তি নেই আমার।

—আপনি বানাবেন?

—কেন, আপত্তি আছে।

—একরত্তিও না। নিজের এলেম তো জানি। সেই ভয়ে বাড়ীতে চা-খাওয়া ভুলেছি।

* * *

চা-টা খেয়ে অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে সুতনুকা। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলো নিখিল পুরো ব্যাপারটা। ইস্ আর আর্দ্ধেকটা গোঁফ যদি কামিয়ে নেওয়া যেতো। সময় পেলো কোথায়। বাব্বাঃ! মেয়ে তো নয়, কথার তুবড়ি। নিখিল আফশোষ করতে করতেই উঠে দাঁড়ায় আয়নায়।

—নাঃ দাড়িটা কামিয়েই ফেলা যাক্। ভাবলো নিখিল। কিন্তু সাবান আছে, আয়না আছে, রেজারটা গেলো কোথায়? ধ্যুস্ এভাবে চলে কখনো! ক'টা বাজে দেখা দরকার—যদি সেলুনটা খুলে থাকে। কোনোমতে রুমাল চাপিয়ে পথটুকু।

—দেরাজ খোলে নিখিল; ঘড়ি নেই।

—"ওঃ হো আলমারীতেই তো রাখলাম তখন—' নিখিল স্বগতোক্তি করে। একটানে বইয়ের আলমারীর পাল্লাটা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে ওর

—আরে 'Casio টেপ রেকর্টার টাও তো বইগুলোর ওপরই রাখা ছিলো। আজ সকালেও আরে, তবে কী!...উদ্দেশ্যহীন দ্রুতপায়ে হেঁটে গিয়ে জানালায় চোখ রাখে নিখিল।

—কোথায় সুতনুকা!!

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এর মাঝে একদিন ভীষণ মজা হল জানো। জমিদার বাবু তো পরিবার শুদ্ধ হৈ-হুল্লোড় করতে এসেছিলেন—। কয়েকদিন আগে।" পরের কথাটা বলতে বলতে সে হেসে গড়িয়ে যায় "তুমি বিশ্বাস করবে না খামিশ -- জমিদার-বাবুর মেয়েগুলো কী বোকা ওরা বিশ্বাস করল না, যে আমার এই গাছগুলো আর কয়েকদিনের মধ্যেই ফল দেবে।"

প্রত্যুত্তরে খামিশ একটু হাসে,

—"সত্যি ?"

—"এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি খামিশ, সব সত্যি। এতটুকুও মিথ্যে নয়।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ওদের চারপাশে অন্ধকারের পর্দা। খামিশ গলার মধ্যে শব্দ করে, যেন কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোহাইলা জিজ্ঞাসু চোখে খামিশের দিকে তাকায়। খামিশ বলে, তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু,—

—'জান সোহাইলা। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। ভালবাসি। ঠিক যেভাবে ওই গাছেরা তাদের শিকড়গুলোকে ভালবাসে।

—"তাহলে খামিশ, এই তো কাজে নামার সময়। আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার সমস্ত কাজ। উফ্ যা মজা হবে না।"

সোহাইলা যেন গান গেয়ে ওঠে।

যুদ্ধক্ষেত্রে

দিগন্তরেখা ক্রমশঃ ধূসর হয়ে আসছে। চারিদিক থেকে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নামে। শিকারীর মত ওৎ পেতে খামিশ শুধু জেগে থাকে। পরিখার মধ্যে থেকে তার অতন্দ্র দৃষ্টি ঘন বনের ভেতর শিকারের খোঁজ করে ফেরে।

ঘুমন্ত সোহাইলার দিকে তাকায় একবার। শ্বাসের তালে তালে বুকটা ওঠা নামা করছে। ঐ ভীষণ নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে খামিশ ভাবে :

ঘুম ঘুম জড়ান, আবেগ-মন্থর কণ্ঠস্বর। সোহাইলা তাকে ডাকে।... খামিশ'।

খামিশ ওকে আরও কাছে টেনে আনে।

—লক্ষ্মীটি। এখন ঘুমোও। আমাদের এখনও তো কত কাজ বাকি আছে... সোহাইলা'।

—'না' খামিশ।' এখন তো আমার জেগে পাহারা দেবার পালা!'

ওর কথায় খামিশ শুধু হাসে। ওর ঘন চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলে :

তোমার পালাটুকু আপাততঃ আমি নিলাম।

সোহাইলা উঠে বসে এবং খামিশ হাত থেকে বন্দুকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলে : কিছুতেই না। তোমার স্ত্রী, হিসেবে আমার বিশেষ কোন সুবিধা গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না খামিশ'।

খামিশ চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আবার সোহাইলা-ই প্রশ্ন করে :

আন্দাজ করতে পারলে ? আমার তো মনে হয় ভোর হবার আগে তেমন কিছু আর ঘটবে না। কি বলো, খামিশ ?

খামিশ চোখ বন্ধ করে গভীর স্মৃতিতে ডুবে যায়। উফ্ কতদিন মা'কে দেখিনি। বুঝলে, সোহাইলা, প্রায় তিনবছর হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই এখনও সেই ক্যাম্পে আছে!

সোহাইলা শক্ত মুঠিতে খামিশের হাত ধরে থাকে। উফ্ একটা অনুভূতি খামিশের স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে নেবে যায়। জমাট অন্ধকারের আড়ালটুকু ভেঙে ফেলে সোহাইলার চোখদুটো দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

কেমন বিষণ্ণ শোনায় খামিশের গলা : খামিশ হঠাৎ থেমে যায়, স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে।

সোহাইলাও বুঝতে পারে। ফিসফিস করে বলে বন্দুকটা দাও। ওদের গাড়িগুলো বোধহয় হাতের কাছেই এসে থেমেছে!"

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে শিরশির করে ওর দেহ। কী ভীষণ ঠাণ্ডা ওটা। সোহাইলা খামিশের দিকে তাকায়। অসম্ভব স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মত দাঁড়িয়ে আছে খামিশ। এই প্রথম বিপদটা ওদের দুজনকে একসঙ্গে রাহুর মত গ্রাস করতে চলেছে। সোহাইলার মনে হয় সেই মুহূর্তের জন্য ওরা দুজনে মিলে গিয়ে একটা গোটা শরীরী অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে! দারুণ দুর্নিবার আকর্ষণ

অনুভব করে সোহাইলা খামিশের জন্য । তীব্র অনুভূতি প্রায় জল এনে দেয় ওর চোখে ।

খামিশ স্থির অকম্পিত স্বরে সোহাইলাকে বলে : সোহাইলা আর সময় নেই, যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে । কথাটা শুনে এতটুকু চঞ্চল হয়না সোহাইলা । আসন্ন যুদ্ধের সংবাদে বরং সে পুলকিত বোধ করে । মুহূর্তে তার মনে হয় একসঙ্গে যুদ্ধ করে মরার মত সুখ বুঝি কিছুতে নেই । পরিখার মধ্যে দিয়ে সে রাইফেলটাকে বাড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকে খামিশ ওকে বলে : সোহাইলা তুমি তৈরী তো ? আর বেশী সময় নেই হাতে । আমাদের একসঙ্গে আক্রমণ হানতে হবে ওদের উপরে ।

উফ্ ! সোহাইলা ভাবে : খামিশ তাকে চুমু খেলেও হয়ত তার এত আনন্দ হত না । রোমাঞ্চে ওর গোটা শরীরটা শিরশির করতে থাকে ।

খামিশ কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় তার মনে হয় খামিশ হয়ত আর কিছু বলবে তাকে ।

খামিশ বলে : 'সোহাইলা' সোহাইলা শ্বাস বন্ধ করে তার কথা শুনতে থাকে—'মনে রেখো, আমাদের একসঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে'

সোহাইলা মনে মনে বলে : খামিশ, তোমাকে কি বলব ? আমি তো এইই চাইছিলাম খামিশ, 'মতটা আবার পরে বদলে ফেলো না যেন ।'

খামিশ সোহাইলার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে :

সোহাইলা ! তুমি কি সহ্য করতে পারবে ? তোমার এই সুন্দর মুখটা যখন ওদের গুলিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ? যখন তোমার দেহটা ধুলোয় লুটোবে ? তখন ? সুড়ঙ্গের বাইরে কিছু দূরে ভারী পায়ের চলাফেরার আওয়াজ ওদের কানে আসে । খামিশ সোহাইলার শান্ত কণ্ঠস্বর শোনে : "খামিশ ! আমি ওদের দেখেছি' ওরা কি জানে তুমি এখানে ? ওরা কি অন্য কিছু খুঁজছে খামিশ ?" খামিশ বিব্রত বোধ করে সোহাইলার প্রশ্নে ।

"ওরা কিন্তু জানে খামিশ ! আমরা এখানে লুকিয়ে আছি—"

সোহাইলার কথা বলায় বাধা পড়ে । বাইরে মাইকে ওদের রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'খামিশ যেখানেই লুকিয়ে থাক আত্মসমর্পণ কর । নইলে...

খামিশ সোহাইলার দিকে তাকিয়ে থাকে । সোহাইলা ঠোঁট কামড়ে ভাবে অন্য কথা । আচ্ছা ! আমি আছি বলেই কি...খামিশ...আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা বোধ করছে ? সর্বনাশ ! খামিশ যদি বলে..., সোহাইলা আর ভাবতেই পারে না । তার দুচোখ ভরে জল আসে ।

খামিশ বোধহয় টের পেয়ে যায় । "সোহাইলা ! তুমি কাঁদছ ?" খামিশ আলতো ভাবে ওর কাঁধ স্পর্শ করে, যেন সঞ্জীবনী স্পর্শে উদ্দীপিত করে তুলতে চায় সোহাইলাকে । খামিশের কথায় সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে "খামিশ—! আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না খামিশ ! আমি তোমাকে ভালবাসি আমার প্রাণের চেয়েও...সোহাইলার কণ্ঠস্বর অশ্রুতে চাপা পড়ে যায় ।

ওদিকে বাইরে মাইকে ঘন ঘন বলতে শোনা যায়, আত্মসমর্পণ করলে তুমি সম্পূর্ণ অক্ষত নিরাপদে থাকবে । আত্মসমর্পণ করলে... ।'

খামিশ বলে, "সোহাইলা ! ওরা তো আর জানে না । এখানে তুমিও আছ । ওরা ভাবছে বুঝি আমি একাই আছি ! ওরা আমাকে চায় ।"

"আমরা একসঙ্গে আছি একসঙ্গে থাকব খামিশ...ওরা আমাদের কিছুতেই আলাদা করতে পারবে না" খামিশ আর কোনও কথা বলে না, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বন্দুকের উপর ঝুঁকে পড়ে । বারুদের বাক্সগুলোকে একত্র করতে থাকে । সোহাইলা তার দুহাত বাড়িয়ে দেয় খামিশের দিকে ।

—আমরা কিন্তু আর ঠিক দুমিনিট সময় দিচ্ছি । এরমধ্যে বেরিয়ে না এলে ; কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে...।

ওদের মাইকের কথা লো খামিশের গায় যেন থুতু ছিটোয় । গা রি রি করে ওর । বন্দুকের ঘোড়ায় খামিশের আঙুল স্থির হয় । মাভৈঃ ! জন্তু-গুলোর সঙ্গে আজ মুখোমুখি লড়াই । তবু যেন মনে হয় সোহাইলা তার কাছে একটা অনতিক্রম্য বাধা । খামিশ ইতস্ততঃ করতে থাকে ।

খামিশ, আমার জন্য ভেবো না তোমার স্ত্রী বলে আমার জন্য কোন বিশেষ সুবিধে নয় : কিছুতেই নয় ; তুমি নির্মম হয়ে ওঠো খামিশ ।

এসব কিছুই খামিশের কানে ঢোকে না । খালি ভাবে, "তুমি কি শিশুর

মত কথা বলছ সোহাইলা? তুমি···?" ভাবনাগুলো দানা বাঁধেনা। এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ায় মগজে।

"তুমি আমাকে ভালবাস না খামিশ! গাছ যেভাবে তার প্রিয় শিকড় ভালবাসে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সোহাইলা। তার তীব্র অথচ চাপা গলার স্বর শোনা যায় "বল বল খামিশ তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?"

পাগলের মত শত্রুদের দিকে তাক করা বন্দুকের দিকে ছুটে যায়।

"বন্ধু! আমাদের মধ্যে কে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের উপর।
কার বন্দুক প্রথম গর্জে উঠবে খামিশ?"

বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করে খামিশের। সামনের এই দুলতে থাকা মৃত্যুটা ওকে হাতছানি দেয়; সমস্ত দুর্বলতা দূরে সরে গিয়ে খামিশের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"সোহাইলা!" আভূতচঞ্চল কণ্ঠস্বর খামিশের "আমি কি বোকা সোহাইলা এই যে কিছুক্ষণ বাদে আমরা আর থাকব না এই ভাবটা কেমন মাথার মধ্যে জেঁকে বসেছিল। আমার হাসি পাচ্ছে। কি কাণ্ড দেখোতো, তোমার আর আমার মধ্যে মৃত্যুটা কেমন উটকো একটা লোকের মত এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হাঃ হাঃ ব্যাটা বড় চালাক। ভেবে ছিল বুঝি ফাঁকতালে খানিক ফয়দা লুটবে।"

দূর, দূর! কোথাকার একটা উটকো, তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব···'ওক্' ছোট্ট একটা হেঁচকি তুলে খামিশের উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর কেমন যেন টাল খেয়ে যায়, পাঁজর ফাঁক করে শত্রু শঙ্কের গুলি অভিনন্দন জানিয়ে গেছে।

"সোহাইলা! এই যে এত সুন্দর সুন্দর নিষ্পাপ গাছগুলো। এর একটাও রক্ষা পাবে না। একটাও না।'

সোহাইলা ···খামিশের গলার স্বর যেন জলহীনতায় ধুঁকতে থাকে। শুধু মরুভূমি একটু একটু করে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর তীব্র হয়ে ওঠে। খামিশ ক্রমশঃ পথ হারিয়ে ফেলে নির্জন মরুভূমির মধ্যে।

খামিশের গলার স্বরে শুধু এক বিষণ্ণতার আভাস পায় সোহাইলা।

কান্নার জন্য প্রস্তুত হয়েও যে পাথরের মত থমকে থাকে। কিছুতেই কাঁদতে পারে না—সেই রকম।'

সোহাইলা সোৎসাহে পর পর দুবার গুলি ছোঁড়ে।

অবশেষে—অনেক পরে খেয়াল করে খামিশের কাঁধে তাজা রক্তের বন্যা, তার মনে হ'ল ফুলের বৃতি থেকে যেন অশ্রু গড়াচ্ছে। ঠিক যেন প্রদীপের পিলসুজ বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে নীচে ..বহু নীচে ..।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হয়। সোহাইলা মুখ ফুটে কিছু বলে না তবু টের পায় নিজের হৃৎপিণ্ডটা থেকে অশ্রু বাষ্প গলার কাছে আটকে। রক্তের স্রোতে ওর চোখ জড়িয়ে আসে যে বুঝতে পারে নিজের হৃৎপিণ্ডটা এতক্ষণ ধরে কেবল প্রাত্যহিক আয়োজনে, গভীর অবসাদে ডুবে গেছিল, কেবল খামিশ নয় সেও এই রুধিরোৎ স্বর্গে। আনন্দটুকু উপভোগ করে শিরায় শিরায়।

কলজে ফুঁড়ে গুলি চলে গেছে খামিশের। সোহাইলা তবু যন্ত্রণাটুকু পরিমাপ করতে পারে না।,

'খামিশ কি ভাবছে কে জানে'—তার দিকে ফিরে তাকাবার আগে সোহাইলা উন্মাদের মত এলোপাতাড়ি গুলি চালায়।

উফ্! এতরক্তও ছিল খামিশের দেহে। প্রতিটা রোমকূপ বেয়ে ঝর্ণার মত বেরিয়ে আসছে ওরা। কাকের শাবকের মুখের ভেতর যে রকম লাল —খামিশের গোটা শরীরটা এখন সেই রকম!

এতটুকু গলা কাঁপে না সোহাইলার। মৃত্যু প্রতিযোগিতার লাল ফিতের ফাঁসটুকু সর্বাগ্রে স্পর্শ করার জন্য সোহাইলা উৎসাহ দেয়।

"ছিঃ খামিশ! তুমি না দেশপ্রেমী! দুয়ারটুকু পার হতে তোমার এত সংশয়? কোমল ত্বকের নিচে ছুঁচ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে গভীর থেকে উঠে সোহাইলার কথাগুলো শ্বাস যন্ত্রটাকে নিঙরে শেষ বাতাসটুকু বের করে দেয় প্রশংসার করতালিতে। সিদ্ধার্থের কোলে লুটিয়ে পড়া শাবকের মত মৃত্যুর জন্য ফোঁপাতে থাকে খামিশ। সে একটা বাঁশের সাঁকো দেখতে পায় চোখের সামনে। সাঁকো ভয়ংকর দুলতে থাকে।

মাথার মধ্যে দিয়ে রৈ রৈ শব্দে মহান অনুভূতিটাকে পৌঁছে দিতে স্নায়ুরা উঠে পড়ে লেগে যায়। মৃত্যু স্বাধীনতার উৎসবে হাত পা যেন আর বশে থাকতে চায় না তার। কেবল একবার জয়ধ্বনি করতে ইচ্ছে হয়! খামিশের স্বদেশ খাঁ খাঁ করছে! বন্দুকের ঘোড়ায় পর্য্যন্ত আর হাত ওঠে না খামিশের!

কারা যেন হাতছানি দেয় খামিশকে। খামিশ দেখতে পায়না, কিন্তু অনুভব করে।

খামিশ কান পেতে ওদের আহ্বান শুনতে থাকে।

রোদ উঠেছে। চলো যাই, খামিশ বিড়বিড় করে।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সব কিছু একাকার হয়ে যায় খামিশের কাছে। চারদিক থেকে মূহুর্মুহু গুলি ছুটে আসে। খামিশের দেহটা বাগানের জল দেওয়া ঝাঁঝরি মত হয়ে যায়।

খামিশ চেষ্টা করে মুখ ফিরিয়ে একবার অন্তত সোহাইলাকে দেখার।

সোহাইলা বন্দুকের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ঠিক যেন কোন উদ্ভিদ বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ঋজু কোনো গাছকে, অপূর্ব দেখায়।

"ইস্! এই অবস্থায় যদি একবার সোহাইলা মুখটা এই দিকে ফেরায়।" খামিশ বড়ো আশা করে যে সোহাইলা অন্তত: একবার এদিকে তাকাবে।

খামিশের ইচ্ছে করে শেষবারের মত সোহাইলার নিষ্পাপ মুখের সৌন্দর্য্য বুকের মধ্যে এঁকে নিতে।

ওই একটামাত্র মুখছবি কিভাবে খামিশকে বারবার পাগল করে দেয়। সোহাইলার চিবুক, পাতলা ঠোঁট থেকে ঝরে পড়া হাসি আর উজ্জ্বল চোখ দুটো সমস্ত জাগতিক দুঃখবোধকে নিমেষে পরাস্ত করে। সব কিছুকে জাদুকরের মত উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে—এই আতুরে মৃত্যুভয়, মা'কে বহুদিন ছেড়ে থাকার দুঃখ।

সীসের মত ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। খামিশ বহুচেষ্টা করে চোখ মেলে তাকাতে। কিন্তু কে যেন বারংবার বন্ধ করে দেয়। চোখের পাতার মত ঐচ্ছিক পেশীগুলোর উপরে আজ আর কোন জারিজুরি খাটেনা খামিশের। দুটো পশম কোমল হাত সযত্নে ঢেকে দিতে থাকে ওর চোখকে। সোহাইলা

বুঝি? অসম্ভব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে খামিশের শ্রবণেন্দ্রিয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দ অবধি বাদ পড়ে না। সব কিছু পরিষ্কার শুনতে পায় সে।

ওই তো সোহাইলার হলুদ পোশাকটা বাতাসে উড়ছে। কেমন বাতাসে সাঁতার কাটছে ওটা। এই তো একবার তাকে ছুঁয়ে যায়।

খামিশ একটু একটু করে নিস্তে হয়ে পড়ে; তৃষ্ণার্ত উট যেন বালিঝড়ে চোখ বুঁজে আছে। একি! তবুও জিয়াদের সরল মুখ খানা কেন বার বার ভেসে উঠছে তার চোখের পর্দায়।

ওঃ জিয়াদ! তোকে একবার সুযোগ দিল না ওরা! চোখের পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার। বুঝি শেষ জলটুকু গড়িয়ে পড়ে খামিশের স্মৃতির জলাধার হতে।

খামিশ অনুভব করে গোধূলি রঙের মত বিষন্ন সোহাইলার দুটো ঠোঁট ওর চিবুক কে আঁকড়ে ধরছে বারবার। পৃথিবীর শেষ ভূখণ্ড অবধি রাঙা হয়ে ওঠে। যেন সূর্যের ঔষধি সুষমা; নিজের সত্তার মধ্যে শুষে নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নদী ফুল পাখির বাঙ্ময় আন্তরিকতা।

সোহাইলা বুঝতে পারে ওর মনের কতগুলো আবেগ কিছুতেই যেন পাশপাশি চলতে চায় না, আবার তারা আলাদা হতে গেলেই টুকুরো টুকুরো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। ছোট্ট বুকটুকুতে বারংবার ফুলে ফুলে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ। ভাঙা ঢেউগুলো ফিরে যায়।

সোহাইলা কিছুই আর স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে ব্যবধানটুকু ঘুচে যায় যেন।

সোহাইলার হাত থেকে ভারী বন্দুকটা গড়িয়ে যায়।

ওর নিজের চোখ দুটোও গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবু সে তার শেষ চৈতন্যটুকুকে সংহত করে খামিশের কানের কাছে মুখ নামিয়ে জোরে চিৎকার করতে থাকে।

"খামিশ! শুনতে পাচ্ছ। খা-মি-শ কত কাজ পড়ে রয়েছে খামিশ তাড়তাড়ি কর।"

এস গোলা বারুদের টুকরোয় শতছিদ্র করে দিই আমাদের এই ছোট্ট তাঁবুটা! আমরা তো আর রইব না। এটাকে ফেলে রেখে কি হবে বল।

তারপর একদিন আকাশ ভেঙে পড়বে বৃষ্টিতে। কেউ দুহাত দূরের জিনিষটা অবধি দেখতে পাবে না দিগন্ত ঝাপসা হয়ে আসবে। তারপর পাহাড়ী নদীতে যেমন করে ঢল নামে তেমন করে শুকনো পাতা পাথরখণ্ড, সমেত আমরাও পৌঁছে যাব মোহনায়- খামিশ। কেমন মতলবটা বলতো?

তোমার পছন্দ হল, হয় নি?

তুমি হাঁ, না কিছুই বলছ না কেন?

খামিশ—। খামিশ। দুহাত দিয়ে তীব্র ভাবে ঝাঁকায় সে খামিশের দেহটা, খামিশ—

খামিশ!...ধিকরে ধিকরে ভাঙতে থাকে সোহাইলার কণ্ঠস্বর। সোহাইলা খামিশের বুকের উপরে হাত বোলায়।

ইস্! একেবারে পাহাড়ী রাস্তা হয়ে গেছে খামিশের বুকটা; আহারে এমন ভাবে গুলি ছুঁড়তে বোধহয় শুধু মানুষেই পারে ক্ষতস্থান গুলো এক একটা ভয়ংকর হ্রদ।

ক্লান্তি অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চায়। দারুণ ঘুম পাচ্ছে তার। চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না। ধুম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজে বেড়ায় খামিশের বুকে।

এক দুই...তিন...ক্ষতস্থানগুলো শুনছে সোহাইলা! চার...পাঁচ...ছয় ..সাত .দশ .বারো ..বা-আ-আ-রো...

সোহাইলা বহু চেষ্টা করে খামিশের হাতটা তুলে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করার।

ইচ্ছেটা পূরণ হয় না ..ফসিল হয়ে রয়ে যায় ওর শরীরেই।

———

—প্রথম মৃত্যু/জেন এল আবিন এল হোসেনি
অনুবাদ হীরক সেনগুপ্ত।

(এই গল্পের প্রথমাংশ 'অ' অক্টোবর, '৮২ সংখ্যায় প্যালেস্টাইন ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছিল।)

With best compliments from :

East India Pharmaceutical Works Ltd.

6, Little Russel Street,
CALCUTTA-700 071

বইমেলা '৮৩র আকর্ষণ—

তরুণ মুখোপাধ্যায় ও উদয় কুমার চক্রবর্তীর যুগ্ম কাব্য সংকলন :

নিজস্ব দর্পণে দু'জন

বাংলা কাব্যধারায় এক আশ্চর্য মৌলিক সংযোজন। এই শতাব্দীর, এই দশকের, এই যুগের অনন্য মায়াবী দর্পণ॥

মূল্য : ২ টাকা

A (অ), Feb. '83. RN. 34415/82 Price Rs. 1

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনাগুলির গ্রাহক হোন ও পড়ুন

সোভিয়েত দেশ

প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সোভিয়েত জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ সোভিয়েত ভারত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা।

চাঁদার হার :	১ বছর	৩ বছর
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়	১০.০০	২০.০০
ইংরাজী—	১২.০০	২৪.০০

সোভিয়েত সমীক্ষা

বিশ্বের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের তত্ত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনামূলক পত্রিকা। মাসে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার :	১ বছর	৩ বছর
ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়	৬.০০	১৪.০০

স্পুৎনিক জুনিয়র

তরুণ বয়েসীদের জন্য বহুবর্ণ চিত্রশোভিত মাসিক পত্রিকা। ছোটদের উপযোগী লেখায় সমৃদ্ধ। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার :	১ বছর	৩ বছর
	৯.০০	২০.২০

ইয়ূথ রিভিয়্যু

ভারতীয় যুব সমাজকে সোভিয়েত যুব সমাজের অনন্য সাধারণ জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করানোর সচিত্র সাপ্তাহিক। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার :	১ বছর	৩ বছর
	৬.০০	১৪.০০

"সোভিয়েত দেশ" গ্রাহকরাই শুধু ১৯৮৩ সালের একখানি সুন্দর ক্যালেণ্ডার উপহার পাবেন।

১লা নভেম্বর ১৯৮২ হইতে গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা শুরু হবে। আমাদের হাতে ক্যালেণ্ডারের সংখ্যা সীমিতসংখ্যক। অতএব নিশ্চিতভাবে ক্যালেণ্ডার পেতে হলে অবিলম্বে গ্রাহক হোন।

আপনার পছন্দমত পত্রিকার নাম এবং কোন ভাষার পত্রিকায় গ্রাহক হতে চান সেটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গ্রাহক চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি মনিঅর্ডার বা পোস্টালঅর্ডার যোগে পাঠান। অথবা আপনি নিজে শনি ও রবি বাদে অন্য যে কোনো দিন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের দপ্তরে আসুন এবং চাঁদা দিয়ে স্বহস্তে ক্যালেণ্ডার সংগ্রহ করুন।

সোভিয়েত দেশ,
১৮, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি, কলি-৭০০০১৯
টেলিফোন নম্বর : ৪৭-৭৫৬৪
৪৭-৭৬৬৬

৩১/২, ডঃ ধীরেন সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। এবং পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স ৫৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।